ভ ই লেনিন

মার্কসবাদের তিনটি উৎস

ও

তিনটি অঙ্গ

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন

মার্কসবাদের তিনটি উৎস ও তিনটি অঙ্গ

রচনাঃ ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন

মূল রুশ ১৯১৩ সালে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত বলশেভিক পত্রিকা জ্ঞানালোক (প্রসভেশ্চনিয়ে)-এর মার্চ, ৩নং সংখ্যায় প্রকাশিত হয় কার্ল মার্কসের ত্রিশতম মৃত্যুবার্ষিকীতে। বলশেভিক পত্রিকা চিন্তাধারা (মিসে)কে জার সরকার নিষিদ্ধ করলে বলশেভিক পার্টি এই জ্ঞানালোক পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

মূল রুশ রচনাটি ও এর ইংরেজী ভাষান্তর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রগতি প্রকাশন থেকে প্রকাশিত ভ ই লেনিন সংগৃহীত রচনাবলী খন্ড ২৩, পৃ ৪০-৪৮-এ। ইংরেজী সংগৃহীত রচনাবলীটি থেকে মার্কস টু মাও ডটকম ওয়েবসাইট কপি সংরক্ষিত করেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রগতি প্রকাশনী রচনাটি বাংলায় ভাষান্তর করে প্রকাশ করে। সিপিএমএলএম বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় অধ্যয়ন গ্রুপ উক্ত বাংলা সংস্করণটিতে অনুবাদের কিছু সংশোধন ও ভাষাগত পরিমার্জন সাধন করে ১৫ই মে ২০২৩ প্রকাশ করে। এর জন্য মার্কস টু মাও ডটকম ওয়েবসাইটে সংরক্ষিত ইংরেজী ভাষান্তরের সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে।

সর্বহারা পথ ওয়েবসাইট থেকে নতুন সংস্করণটি পড়া ও প্রিন্ট নেয়া যাবে।

যে মানসিক দাসত্বের মধ্যে নিপীড়িত শ্রেণীগুলির সকলে এত দিন বাঁধা পড়েছিল, তা থেকে বেড়িয়ে আসার পথ সর্বহারাশ্রেণী পেয়েছে একমাত্র মার্কসের দার্শনিক বস্তুবাদ থেকে। একমাত্র মার্কসের অর্থনৈতিক তত্ত্বেই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে সাধারণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে সর্বহারাশ্রেণীর সত্যিকার অবস্থাটা কী।

আমেরিকা থেকে জাপান এবং সুইডেন থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা, সারা দুনিয়া জুড়ে সর্বহারাশ্রেণীর স্বাধীন সংগঠনের সংখ্যা বাড়ছে। নিজেদের শ্রেণীসংগ্রাম চালিয়ে শিক্ষিত ও দীক্ষিত হয়ে উঠছে সর্বহারাশ্রেণী, বুর্শোয়া সমাজের কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে উঠছে, ক্রমেই নিবিড় হয়ে জোট বাঁধছে, শিখছে কী করে নিজেদের সাফল্যের হিসেব নিকেশ করতে হয়, আপন শক্তিসমূহকে তারা মজবুত করে তুলছে এবং বেড়ে উঠছে অপ্রতিহতভাবে।।

বাংলা ভাষান্তরের ভূমিকা

লেনিন তাঁর ছোট এই রচনায় অল্প কথায় মার্কসবাদকে ব্যক্ত করেছেন। তাই এই রচনাটি অনেক বৃহৎ রচনার চেয়েও গুরুত্ব ও তাৎপর্য ধরে। মার্কসবাদ জানতে হলে সাম্যবাদী ইশতেহারের সাথে এই রচনাটি এর প্রতিটি লাইনসহকারে সকল সচেতন কর্মীকে অধ্যয়ন করতে হবে। আমরা এই রচনাটি থেকে আরো সংক্ষেপে মার্কসবাদের মূল কথা ব্যক্ত করবঃ

মার্কসবাদকে বুঝতে হলে আমাদের এর তিনটি দিক বুঝতে হবেঃ দর্শন, অর্থনীতি ও রাজনীতি।

মার্কসবাদের দর্শন বস্তুবাদ। আমরা যা কিছু অস্তিত্বমান দেখি অথবা না দেখি, তা হল বস্তু। আমরা চাই আর না চাই, আমাদের অস্তিত্ব থাক বা না থাক, তা বিরাজমান। ক্রমে ক্রমে এই জগত, ঘটনা আমাদের মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হতে থাকে, যার কোন শেষ নেই। এই প্রতিফলনে তৈরি হয় চেতনা ও জ্ঞান। তাহলে কোনটা আদি? আমেরিকা কলম্বাস আবিষ্কার করেনি, কলম্বাস সেখানে পৌঁছলে, আমেরিকা নামক বস্তুটা ইউরোপের মানুষের চেতনায় আসল। আমেরিকা আগেই ছিল। তাই বস্তু আদি, আর চেতনাটা আসল পরে। এই হল বস্তুবাদ। মার্কসবাদী বস্তবাদ দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক। সকল বস্তুর মধ্যেই রয়েছে দ্বন্দ্ব। অর্থাৎ সংগ্রামরত দুই দিক। মানুষের হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস যেমন একবার সংকুচিত ও একবার প্রসারিত হয়, পরমানুর মধ্যে যেমন ইলেক্ট্রন ও প্রোটন দুই বিপরীত দিক, তেমনি সকল জিনিসের মধ্যেই দুই বিপরীত দিক রয়েছে।

আর দুই বিপরীত দিক সংগ্রামরত। এই বস্তুবাদ ঐতিহাসিক, কারণ সমাজজীবনে এই বস্তুবাদ প্রযুক্ত হয়। একই দ্বন্দ্ব সমাজজীবনেও বিরাজমান, যথাঃ শ্রেণীসংগ্রাম। বস্তুবাদী নিয়মে যেমন বস্তু হল সেই ভিত্তি যা থেকে চেতনার উদ্ভব ঘটে, একইভাবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ দেখায় যে সামাজিক বস্তু হল সামাজিক ভিত্তিঃ অর্থনৈতিক ভিত্তি, যা থেকে সামাজিক চেতনা যথা রাষ্ট্র, রাজনীতি, শিল্পসাহিত্য গড়ে উঠে।

মার্কসবাদের অর্থনীতির মূল তত্ত্ব হল উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব। পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকেরা যে শ্রম দেয়, তার মধ্যে একটি অংশের মাধ্যমে তার ভরণপোষণ হয় যা হচ্ছে মজুরি, আর একটি অংশ হচ্ছে বাড়তি শ্রম যা হচ্ছে পুঁজিপতিদের মুনাফা। এই বাড়তি শ্রম শোষণ করেই পুঁজিপতিদের পুঁজি বাড়ে। সকল শোষণমূলক সমাজেই এই শোষণ ঘটে। আমরা আমাদের চোখের সামনে দেখি সম্পদ বাড়ছে। কীভাবে? এই বাড়তি শ্রম থেকেই।

মার্কসবাদের রাজনীতির মূলকথা হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণীকে তাঁর ঐতিহাসিক কর্তব্য কর্ম সম্পর্কে সচেতন করা। যে আজকের দিনের বিপ্লবী শ্রেণী, যে সচেতন হবে যে তার শ্রম শোষণ করা হচ্ছে, তাকে এই শোষণ বন্ধ করে দিতে হবে। তাই মার্কস নিয়ে এলেন সর্বহারা বিপ্লবের ধারণা। বিপ্লবের মাধ্যমে সর্বহারা শ্রেণী সারা দুনিয়ার দেশে দেশে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবে, পুরোনা রাষ্ট্রকে ভেঙে দেবে, তৈরি করবে এমন রাষ্ট্র যে নিজেই আর নিজের অস্তিত্বের প্রয়োজন রাখবেনা, তখন দুনিয়া এগিয়ে চলবে এমন এক রাষ্ট্রহীন সাম্যবাদী সমাজের দিকে, যেখানে কোন শোষণ থাকবেনা।।

কেন্দ্রীয় অধ্যয়ন গ্রুপ

বাংলাদেশের সাম্যবাদী পার্টি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী

১৫ই মে ২০২৩

মরিয়া প্রতিবন্ধকতা ছাড়া ভূমিদাস কর্তৃক মালিক শ্রেণীর ওপর রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটি বিজয় লাভও সম্ভব হয়নি। পুঁজিবাদী সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে মরণপণ সংগ্রাম বিনা কোনো পুঁজিবাদী দেশই কমবেশি মুক্ত ও গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গড়ে ওঠে নি।

মার্কসের প্রতিভা এইখানে যে, এ থেকে তিনি সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হন ও তাকে সুসংগতরূপে বিকশিত করেন যা পাওয়া যায় বিশ্বইতিহাসের শিক্ষা থেকে। সে সিদ্ধান্ত হল শ্রেণীসংগ্রামের মতবাদ।

যেকোনো নৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক বচন, ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতির পেছনে কোনো না কোনো শ্রেণীর স্বার্থ আবিষ্কার করতে না শেখা পর্যন্ত লোকে রাজনীতির ক্ষেত্রে চিরকাল প্রতারণা ও আত্মপ্রতারণার নির্বোধ বলি হয়েছিল এবং চিরকাল তাই থাকবে। পুরনো ব্যবস্থার রক্ষকদের কাছে সংস্কার ও উন্নয়নের প্রবক্তারা সর্বদাই বোকা বনবে যদি তারা এ কথা না বোঝে যে, যত অসভ্য ও জরাজীর্ণ মনে হোক না কেন, প্রত্যেকটি পুরনো প্রতিষ্ঠান টিকে আছে কোনো না কোনো শাসক শ্রেণীর শক্তির জোরে। আর এইসব শ্রেণীর প্রতিরোধ চূর্ণ করার শুধু একটি উপায় আছেঃ যে শক্তি পুরনোর উচ্ছেদ ও নতুনকে সৃষ্টি করতে পারে এবং নিজের সামাজিক অবস্থানহেতু যা তাকে করতেই হবে— তেমন সব শক্তিকে আমাদের চারপাশের সমাজের মধ্য থেকেই আবিষ্কার করে তাকে দীক্ষিত ও সংগ্রামের জন্যে সংগঠিত করে তোলা।

৩

ভূমিদাস প্রথার পতনের পর দুনিয়ায় 'মুক্ত' পুঁজিবাদী সমাজের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে একথা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, মেহনতি মানুষের ওপর পীড়ন ও শোষণের একটি নতুন ব্যবস্থাই হল এ মুক্তির অর্থ। সে পীড়নের প্রতিফলন ও প্রতিবাদ স্বরূপ নানাবিধ সমাজতান্ত্রিক মতবাদ অবিলম্বে দেখা দিতে শুরু করে। কিন্তু আদিম সমাজতন্ত্র ছিল কল্পনাশ্রয়ী (ইউটোপীয়) সমাজতন্ত্র। পুঁজিবাদী সমাজের তা সমালোচনা করেছে, নিন্দা করেছে ও অভিশাপ দিয়েছে, স্বপ্ন দেখেছে তার বিলুপ্তির, উন্নততর এক ব্যবস্থার কল্পনায় মেতেছে, আর ধনীদের বোঝাতে চেয়েছে শোষণ নীতিবিগর্হিত কাজ।

কিন্তু সত্যিকারের উপায় দেখাতে কল্পনাশ্রয়ী সমাজতন্ত্র পারেনি। পুঁজিবাদের আমলে মজুরি-দাসত্বের সারমর্ম কী তা সে বোঝাতে পারেনি, পুঁজিবাদের বিকাশের নিয়মগুলি কী তাও সে আবিষ্কার করতে পারে নি, খুঁজে পায় নি সেই সামাজিক শক্তি যা নতুন সমাজের নির্মাতা হবার ক্ষমতা ধরে।

ইতিমধ্যে সামন্ততন্ত্র তথা ভূমিদাসত্বের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের সর্বত্র এবং বিশেষ করে ফ্রান্সে যে সব উত্তাল বিপ্লব শুরু হয়ে গিয়েছিল, তা থেকে উত্তরোত্তর পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, শ্রেণীসমূহের সংগ্রামই হল সমস্ত বিকাশের ভিত্তি ও চালিকা শক্তি।

মার্কসবাদের তিনটি উৎস ও তিনটি অঙ্গ

সভ্য দুনিয়ার সর্বত্র সরকারী এবং উদারনৈতিক উভয় প্রকার বুর্শোয়া বিজ্ঞানের পক্ষ থেকে মার্কসের শিক্ষামালার প্রতি চূড়ান্ত শত্রুতা ও আক্রোশ দেখা যায়; মার্কসবাদকে তা দেখে একধরণের 'ক্ষতিকর গোষ্ঠী' হিসেবে। অবশ্যই অন্য মনোভাব আশা করা বৃথা, কেননা শ্রেণীসংগ্রামের ওপর গড়ে ওঠা সমাজে 'নিরপেক্ষ' সমাজবিজ্ঞানের অস্তিত্ব অসম্ভব। সবরকমের সরকারী ও উদারনৈতিক বিজ্ঞানই কোন না কোনভাবে মজুরি-দাসত্বের সমর্থন করে থাকে, আর সে মজুরি-দাসত্বের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন যুদ্ধ ঘোষণা করেছে মার্কসবাদ। মজুরি দাসত্বের সমাজে বিজ্ঞানের প্রতি নিরপেক্ষতা আশা করা, আর পুঁজির মুনাফা কমিয়ে শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানো উচিৎ নয় কি—এই প্রশ্নে কারখানা মালিকদের কাছ থেকে নিরপেক্ষতা আশা করা সমান সরল বোকামি।

কিন্তু এইটুকুই সব নয়। দর্শনের ইতিহাস এবং সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে অতি পরিস্কার করে দেখা যায় যে, মার্কসবাদ বিশ্বসভ্যতার বিকাশের রাজপথ থেকে বহুদূরে জন্ম নেয়া কোন সংকীর্ণ ও গন্ডীবদ্ধ 'গোষ্ঠীবাদী' মতবাদ নয়। বরং মার্কসের সমগ্র প্রতিভাটাই এইখানে যে মানবসমাজের অগ্রণী ভাবনায় যেসব জিজ্ঞাসা আগেই দেখা দিয়েছিল তিনি তারই সুসংগঠিত জবাব দিয়েছেন।

তাঁর মতবাদের উদ্ভব হয়েছে দর্শন, রাজনৈতিক অর্থনীতি ও সমাজতন্ত্রের মহানতম প্রতিনিধিরা যে শিক্ষা দান করেছিলেন, তারই সরাসরি ও অব্যবহিত ধারাবাহিকতা হিসেবে।

মার্কসবাদী মতবাদ সর্বশক্তিমান কারণ, তা সত্য। এ মতবাদ সুসম্পূর্ণ ও সুসামঞ্জস, এর কাছ থেকে লোকে একটা সামগ্রিক বিশ্বদৃষ্টি লাভ করে যা কোন রকম কুসংস্কার, প্রতিক্রিয়া অথবা বুর্শোয়া নিপীড়নের কোনো রূপ সমর্থনের সঙ্গে আপোস করে না। ঊনিশ শতকের জার্মান দর্শন, ইংরেজী রাজনৈতিক অর্থনীতি আর ফরাসী সমাজতন্ত্র রূপে মানবজাতির যা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তার ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী হল মার্কসবাদ।

মার্কসবাদের এই তিনটি উৎস যা একই সাথে তার তিনটি অঙ্গও, সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

অথচ যৌথ শ্রমের ফল আত্মসাৎ করে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি। বৃদ্ধি পায় উৎপাদনের নৈরাজ্য, সংকট, বাজারের জন্য ক্ষিপ্ত প্রতিযোগিতা, আর ব্যাপক জনসাধারণের জীবন ধারণের অনিশ্চয়তা।

পুঁজির কাছে শ্রমিকদের পরাধীনতা বাড়িয়ে তুলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সম্মিলিত শ্রমের মহাশক্তি গড়ে তোলে।

পণ্য অর্থনীতির ভ্রূণাবস্থা থেকে, সরল বিনিময় থেকে শুরু করে তার সর্বোচ্চ রূপ বৃহদাকার উৎপাদন পর্যন্ত মার্কস পুঁজিবাদের বিকাশ পর্যালোচনা করছেন।

আর নতুন পুরনো সকল পুঁজিবাদী দেশের অভিজ্ঞতায় মার্কসের এ মতবাদের সঠিকতা বছরের পর বছর বেশি বেশি শ্রমিকের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠছে।

সারা দুনিয়ায় পুঁজিবাদের জয় হয়েছে, কিন্তু এ জয় শুধু পুঁজির ওপর শ্রমের বিজয়লাভের পূর্বাভাস।

জমি, কলকারখানা ও শ্রমের হাতিয়ারপাতির মালিকের কাছে মজুরি-শ্রমিক তার শ্রমশক্তি বিক্রি করে। শ্রমদিনের এক অংশ সে খাটে তার সপরিবার ভরণপোষণের খরচা তোলার জন্যে (মজুরি), বাকি অংশটা সে খাটে বিনামজুরিতে, সৃষ্টি করে পুঁজিপতিদের জন্য উদ্বৃত্ত মূল্য, পুঁজিপতি শ্রেণীর মুনাফা ও সম্পদের উৎস।

মার্কসের অর্থনৈতিক তত্ত্বের ভিত্তি হল এই উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব।

শ্রমিকদের মেহনতে গড়া এই পুঁজি শ্রমিকদের পিষ্ট করে, ক্ষুদে মালিকদের ধ্বংস করে, এবং সৃষ্টি করে বেকার বাহিনীর। শিল্পের ক্ষেত্রে বৃহদাকার উৎপাদনের জয়যাত্রা অবিলম্বে চোখে পড়ে, কিন্তু কৃষিক্ষেত্রেও একই ব্যাপার দেখা যাবেঃ বৃহদাকার পুঁজিবাদী কৃষির প্রাধান্য বাড়ছে, যন্ত্রপাতির নিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে, কৃষকের অর্থনীতি এসে মুদ্রাপুঁজির ফাঁসে আটকে যাচ্ছে, তারপর নিজের পশ্চাতপদ প্রযুক্তির বোঝায় ভেঙ্গে পড়ছে ও ধ্বংস পাচ্ছে। কৃষিতে ক্ষুদ্রাকার উৎপাদনের যে ভাঙন তার রূপগুলো ভিন্ন, কিন্তু ভাঙনটা তর্কাতীত সত্য।

ক্ষুদ্রাকার উৎপাদনকে ধ্বংস করে পুঁজি শ্রম-উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি ঘটায় এবং বড় বড় পুঁজিপতিদের সঙ্ঘগুলির একচেটিয়া সৃষ্টিতে চালিত করে। উৎপাদনটাও উত্তরোত্তর সামাজিক হতে থাকেঃ লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি শ্রমিক বাঁধা পড়ে একটি প্রণালীবদ্ধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়,

১

মার্কসবাদের দর্শন হল বস্তুবাদ। ইউরোপের সমগ্র আধুনিক ইতিহাস ধরে এবং বিশেষ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফ্রান্সে যখন সবরকমের মধ্যযুগীয় জঞ্জালের বিরুদ্ধে, প্রতিষ্ঠান ও ধ্যানধারণায় নিহিত ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর সংগ্রাম জ্বলে উঠেছিল, তখন থেকেই বস্তুবাদই দেখা দিয়েছে একমাত্র সঙ্গতিপরায়ন দর্শন হিসেবে, যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সমস্ত শিক্ষায় বিশ্বস্ত আর কুসংস্কার, ভন্ডামি প্রভৃতির শত্রু। গণতন্ত্রের শত্রুরা তাই বস্তুবাদকে "খন্ডন", ধূলিসাৎ ও ধিকৃত করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে আর সমর্থন করেছে নানা ধরনের দার্শনিক ভাববাদ যা সর্বদাই পর্যবসিত হয় কোনো না কোনো ভাবে ধর্মের সংরক্ষণে অথবা সমর্থনে।

মার্কস ও এঙ্গেলস অতি দৃঢ়তার সঙ্গে দার্শনিক বস্তুবাদকে সমর্থন করেছেন এবং এই ভিত্তি থেকে যেকোনো বিচ্যুতিই যে কী দারুণ ভূল তা বারবার ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন। তাদের মতামত সবচেয়ে পরিষ্কার করে এবং বিশদে ব্যক্ত হয়েছে এঙ্গেলসের 'ল্যুডভিগ ফয়েরবাখ' ও 'ড্যুরিঙের বক্তব্য খণ্ডন' রচনায়। 'সাম্যবাদী ইশতেহার' এর মতো এ বই দুইখানিও প্রতিটি সচেতন শ্রমিকের নিত্যপাঠ্য।

আঠারো শতকের বস্তুবাদেই কিন্তু মার্কস থেমে যান নি, দর্শনকে তিনি এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এ দর্শনকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন জার্মান ধ্রুপদী দর্শনের সম্পদ দিয়ে, বিশেষ করে হেগেলীয় তন্ত্র দিয়ে, যা আবার পৌঁছিয়েছে ফয়েরবাখের বস্তুবাদে। এই সব সম্পদের মধ্যে প্রধান হল দ্বান্দ্বিকতা, অর্থাৎ বিকাশের পূর্ণতম, গভীরতম ও সামগ্রিক তত্ত্ব, যে মানব জ্ঞান চির বিকাশমান পদার্থের প্রতিফলন তার আপেক্ষিকতার তত্ত্ব।

জরাজীর্ণ ও পুরনো ভাববাদে নব নব প্রত্যাবর্তনের সমস্ত বুর্শোয়া দার্শনিক শিক্ষা সত্ত্বেও, রেডিয়াম, ইলেকট্রন, মৌলিক পদার্থের রূপান্তর ইত্যাদি প্রকৃতিবিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কারসমূহ মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের চমৎকার প্রমাণ।

দার্শনিক বস্তুবাদকে গভীরতর ও বিকশিত করে মার্কস তাকে সম্পূর্ণতা দান করেন, প্রকৃতি বিষয়ক জ্ঞানকে প্রসারিত করেন মানবসমাজের জ্ঞানে। বৈজ্ঞানিক চিন্তার এক শ্রেষ্ঠ মহাকীর্তি হল মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। ইতিহাস ও রাজনীতি বিষয়ক মতামতে যে বিশৃংখলা ও খামখেয়ালের রাজত্ব এযাবৎ চলে আসছিল তার বদলে দেখা দিল এক আশ্চর্য রকমের সামগ্রিক ও সুসামঞ্জস বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, যা দেখাল কী করে উৎপাদনশক্তিসমূহের বিকাশের ফলে আমাদের সমাজজীবনে একটি ব্যবস্থা থেকে গড়ে উঠে আরেকটি উন্নত সমাজঃ যথা সামন্তবাদ থেকে জন্ম নিল পুঁজিবাদ।

মানুষের অস্তিত্ব থাক না থাক যে প্রকৃতি অস্তিত্বশীল থাকে, তার প্রতিফলন যেমন মানুষের জ্ঞান অর্থাৎ বিকাশমান বস্তুর প্রতিফলন, তেমনি সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিফলনই হল মানুষের সামাজিক জ্ঞান (অর্থাৎ দার্শনিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন মতামত ও তত্ত্ব)। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি হল অর্থনৈতিক বুনিয়াদের উপরিকাঠামো। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখা যায় যে, আধুনিক ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক রূপ যত বিভিন্ন হোক, তার কাজ হল সর্বহারার ওপর বুর্শোয়া প্রভুত্ব সংহত করা।

মার্কসের দর্শন হল পরিপূর্ণ দার্শনিক বস্তুবাদ যা মানবসমাজকে এবং বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীকে তার জ্ঞানাঞ্জন শলাকা প্রদান করেছে।

২

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই হল ভিত্তি, তার ওপরে রাজনৈতিক উপরিকাঠামো দন্ডায়মান—একথা উপলব্ধির পর মার্কস তাঁর সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেন এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অধ্যয়নে। মার্কসের প্রধান রচনা 'পুঁজি'তে আধুনিক অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পর্যালোচিত হয়েছে।

মার্কসের পূর্বেকার ধ্রুপদী রাজনৈতিক অর্থনীতির উদ্ভব হয়েছিল পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিকশিত দেশ ইংল্যান্ডে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা করে অ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো শ্রমের মূল্যতত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন। মার্কস তাদের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি এ তত্ত্বকে নতুন করে সুসিদ্ধ করেন ও সুসঙ্গতরূপে বিকশিত করেন। তিনি দেখান যে, পণ্যের উৎপাদনে সামাজিকভাবে আবশ্যক যে শ্রমসময় ব্যয় হয়েছে, তা দিয়েই তার মূল্য নির্ধারিত হয়।

বুর্শোয়া অর্থনীতিবিদেরা যেখানে দেখেছেন দ্রব্যের সঙ্গে দ্রব্যের সম্পর্ক (এক পণ্যের সঙ্গে অন্য পণ্যের বিনিময়), মার্কস সেখানে উদ্ঘাটিত করলেন মানুষে মানুষে সম্পর্ক। পণ্য বিনিময়ের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে বাজারের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদকের সংযোগ। অর্থ মানে হচ্ছে এই উৎপাদকদের গোটা অর্থনৈতিক জীবন অবিচ্ছিন্ন হয়ে সংযুক্ত হচ্ছে একটি অখন্ড সমগ্রতায়। পুঁজির অর্থ এই যোগসূত্রের আরো বিকাশঃ মানুষের শ্রমশক্তি পরিণত হচ্ছে পণ্যে।